রবীন্দ্রনাথের বলশেভিক অভিজ্ঞতা

অপূর্ব দাশগুপ্ত

কিছুদিন আগে বিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন ও কর্মকাণ্ড পড়তে পড়তে রুশ-বিপ্লবের রাশিয়ার চিত্র কিছুটা জেনেছিলাম।[১] দেখলাম আমাদের প্রিয় কবিও রাশিয়ায় গিয়েছিলেন বিপ্লবের ১৩ বছর বাদে ১৯৩০ সালে।[২] মহাপ্রতিভাধর মানুষটির রুশ অভিজ্ঞতা কেমন? বলশেভিকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কি তিনি দেখেছিলেন, লিখেছিলেন, জানতে ইচ্ছে হল। আর পড়লাম রাশিয়ার চিঠি।

রবীন্দ্রনথ যখন রাশিয়ায় পৌঁচেছেন বিপ্লবোত্তর শিশু দেশটি তখন বহিঃশক্তির চোখরাঙগানি ও কুৎসাকে উপেক্ষা করে এবং আভ্যন্তরীণ বিবিধ বাধা কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। আর এখন এই মুহূর্তে যখন এই লেখাটি লিখছি তখন সমাজতান্ত্রিক সোহ্বিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে গেছে। অথচ একবিংশ শতকের সুরুর সঙ্গে বিংশ শতকের প্রায়ম্ভের কতটাই না মিল। বিংশ শতাব্দীতেও যেমন তেমনি একবিংশ শতাব্দীতেও খেটে খাওয়া মানুষ ক্ষুব্ধ, প্রতিবাদ মুখর এবং সেই সঙ্গে হতাশ। ধনতন্ত্র - পূর্ব শতাব্দীর মতো এ শতাব্দীতেও তার ক্ষয়গুলি নিয়ে উপস্থিত। সাম্রাজ্যবাদও তাই। আক্রান্ত ইরাক তার প্রমাণ। তবে বিগত শতকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ধনতন্ত্রের বিকল্প এক শক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যা ১৯৯১ সালে সোহ্বিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে আপাতত, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ নেই তা নয় কিন্তু সে প্রতিবাদ কোন নির্দিষ্ট ছকে এগুচ্ছে না। এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে 'রাশিয়ার চিঠি' পড়তে বসা এক বিরল অভিজ্ঞতা।

কবি যখন রাশিয়ায় এলেন তখন তাঁর বয়স সত্তর। তিনি লিখছেন, 'আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, অতএব আমাকে সত্য হবার চেষ্টা করতে হবে, প্রিয় হবার নয়।' এই মন নিয়েই তিনি যা দেখেছেন তা লিখেছেন। 'আগাগোড়া সকল মানুষকেই' জাগিয়ে তোলার প্রয়াস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।[৩] 'শিক্ষা-কৃষি-যন্ত্র' এই তিন পথ দিয়ে সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনার প্রশংসা করেছেন বারংবার আবার সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে তুলে ধরেছেন দেশটির ভবিষ্যৎ নিয়ে, এই নতুনতম পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে তাঁর আশঙ্কার কথা। সেই সঙ্গে শ্রেণি বিভক্ত সমাজ, বিপ্লব ও শিল্পকলা, ধর্মতন্ত্র, ধনতন্ত্র, মুনাফা কিংবা লোভ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত। বিষয়গুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর ভাষার অসামান্যতার কথা উল্লেখ করা বাতুলতা কিন্তু যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় তিনি রেখেছেন রাশিয়ার শিক্ষা-সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর, যেভাবে তিনি বারংবার তুলনা টেনেছেন ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে রুশ দেশের বিপ্লব-পূর্ব ও বিপ্লবোত্তর অবস্থার এবং সেই বিচার করে দেখিয়েছেন রাশিয়া ইয়োরোপ এবং ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্নতার কথা তো এক কথায় আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। তাঁর চিন্তার সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে অনেকে হয়ত একমত হবেন না। কিন্তু তাঁর চিন্তার নিজস্বতা ও সততাকে উপেক্ষা করার উপায় কারো নেই। এই প্রবন্ধে সামাজিক রাষ্ট্রিক বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন মতামতগুলি আমরা দেখবার চেষ্টা করবো। বলাবাহুল্য তাঁর মতামতগুলি রুশ দেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই উঠে এসেছিল।

সাম্য-অসাম্য ভাবনা

রাশিয়ায় উপস্থিত হয়ে এ দেশটির অন্য সমস্ত দেশের বিপরীত পথে হেঁটে উচ্চ-নীচ সকলে একত্রে এগিয়ে যাবার প্রয়াস প্রত্যক্ষ করে তিনি লিখেছেন ঃ 'চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই। দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। রবীন্দ্রনাথ এদের কষ্টের কথা অসম্মনের কথা অন্তর থেকে অনুভব করেও মনে করতেন, অন্তত রাশিয়ায় আসার পূর্বে মনে করতেন, অসাম্য অপ্রতিরোধ্য। কেননা একদল তলায় না থাকলে আরেকদল উপরে থাকতে পারে না। উপরে কিছু মানুষের থাকাও কিন্তু প্রয়োজন। কেননা উপরে না থাকলে অবকাশ মেলে না। আর সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি ফলে অবসরের ক্ষেত্রে। তিনি লিখেছেন ঃ 'কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তো মানুষের মনুষ্যত্ব। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা।' তাই, 'মানুষের সভ্যতার এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে।' মানুষের সমাজে সকলেই তো সমান প্রতিভাধর হয় না। বুদ্ধির দিক থেকে এগিয়ে থাকা মানুষদের যদি খাওয়া পরার চিন্তায় দিন কেটে যায়, অবসর না মেলে, তবে সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলি ফলবে কি করে? কিন্তু 'সভ্যতার পিলসুজ' যারা, যারা 'মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরে সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গাড়িয়ে পড়ে' —এদের ভবিষ্যত কি? তিনি লিখছেন ঃ 'যে সমস্ত মানুষ অবস্থার গতিকে নয়, শরীর মনের গতিকে নীচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজের যোগ্য যথাসম্ভব তাদের শিক্ষাস্বাস্থ্য সুখসুবিধার জন্য চেষ্টা করা উচিত।' রবীন্দ্রনাথ জানেন যে শরীর - মনের যোগ্যতায় সকল মানুষ সমান হতে পারে না এবং অনভিপ্রেত হলেও কিছু মানুষ নীচের তলায় কাজ করবারই উপযুক্ত কিন্তু তবুও তাঁর উপলব্ধি, 'অধিকাংশ মানুষকে তলায় রেখে অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চে থাকবে একথা অনিবার্য মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।' অর্থাৎ অসাম্য অপ্রতিরোধ্য হলেও অমানবিক। তিনি মনে করেন সাধারণ মানুষের উপরকার দয়া দিয়ে হয়

সৃষ্টিসন্ধান

না। বাইরে থেকে উপকার করতে গেলে পদে পদে তার বিকার ঘটে। সমান হতে পারলে তবেই সত্যকারের সহায়তা সম্ভব –'যে মানুষ সম্মান করতে পারে না সে মানুষ উপকার করতে অক্ষম।' রশিয়ায় এসে কবি উপলব্ধি করলেন, 'রাশিয়ায় একেবারে গোড়া থেকে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে।' এই অভিজ্ঞতা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও, 'তার শেষ ফলের কথা এখনো বিচার করার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।'

অর্থকে ঘিরে যে শ্রেণী বৈষম্য তা প্রাচীন ভারতের নিজস্ব বিষয় নয়। কবি বলেন এই বৈষম্য এসেছে পশ্চিমের প্রভাবে। ভারতের সংসার যাত্রায় ধনী-দরিদ্র সকলেরই মোটামুটি এক রকমের চাল ছিল। তফাৎ ছিল সেটা বৈদগ্ধ্যকে ঘিরে, সংগীত, শিক্ষাকে ঘিরে। ইংরেজ বণিকের দৌলতে অফিসবিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল। এরাই বিলিতি বাবুগিরির প্রচলন শুরু করে দিল। পূর্বে শ্রেণীগত পার্থক্যের বিপরীতে ছিল 'কৌলিক রীতির পার্থক্য', অর্থাৎ, ভাষাভাবভঙ্গী আচার- বিচারগত বিশেষত্ব। ইংরেজ আগমনের পরই ধনের বিশিষ্টতা বুদ্ধি বিদ্যাকে পেছনে ফেলে দিল। কবি লিখেছেন ঃ 'এই (ধনের) বিশিষ্টতার গৌরব মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অগৌরব।' উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে সমাজ বিবর্তনের প্রতি স্তরে অর্থনৈতিক শ্রেণি ধারণা অন্তত প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মানেননি। বারং বৈশ্যযুগের পূর্বে ক্ষাত্রযুগে রাজা-প্রজা সম্পর্কের মধ্যে আধুনিক অর্থে শোষক-শোষিত বা বৈরীমূলক সম্পর্ক এতটা তীব্র ছিল না। তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষের মুসলমান - শাসন বিস্তারের ভিতরকার মানসটি ছিল রাজমহিমা লাভ। পরে ইয়োরোপ থেকে পণ্যতরীতে যারা এলেন বীরের সম্মান তাদের লক্ষ্য ছিল না — তারা মুনাফার অঙ্ক বাড়াতে চাইলেন। এই বণিকেরা 'চেয়েছিল সিদ্ধি, কীর্তি নয়'। তাবলে বণিক-পূর্ব শাসকেরা অত্যাচারী ছিলেন না তা নয় —'পূর্বতন রাজ গৌরব লোলুপেরা যখন এদেশে রাজস্ব করত তখন এদেশে অত্যাচার অবিচার অব্যবস্থা ছিল না একথা বলা চলে না। কিন্তু তারা ছিল এদেশের অঙ্গীভূত। তাঁদের আঁচড়ে দেশের গায়ে যা ক্ষত হয়েছিল তা বুকের উপরে; রক্তপাত অনেক হয়েছে, কিন্তু অস্থিবন্ধনীগুলোকে নাড়িয়ে দেয়নি।' যেহেতু বীর্যবান রাজার লোভ বণিকের লোভের সঙ্গে তুলনীয় নয় তাই রাজগৌরবের সঙ্গে প্রজাদের একটা মানবিক সম্বন্ধ থাকে। ''কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রেরণাশক্তি বীর্যাভিমান নয়, সে হচ্ছে ধনের লোভ'' সুতরাং এর নির্মমতা অনেক গভীর। রাজা-প্রজার সম্পর্কও সুতরাং মানবিক নয়।

ঐকান্তিক কৃষিক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা

পল্লীর হিতসাধনা রবীন্দ্রচিন্তার একটা মস্ত বড় দিক। চাষীদের মঙ্গলের উপায় দেশে থাকতে তিনি ভেবেছেন বহুবার কিন্তু রাশিয়ায় এসে এই মাত্র ক'বছরেই চাষীদের মানসিকতার এবং জীবনযাত্রার প্রভুত উন্নতি দেখে জমিদার বংশীয় তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এ যেন আরব্য উপন্যাসের যাদুকরের কীর্তি। অথচ, 'বছর দশেক আগে এদেশের কৃষককূল আমাদের দেশের জন-মজুরদের মতোই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল।' '...দুখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়ছে... যারা এদের জুতো - পেটা করতো তাদের জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল।' কিন্তু, 'কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নাড়িয়ে দিলে যে কি করে' এই ভেবে কবি বিস্মিত বোধ করেন।

চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে এটাই রবীন্দ্রনাথের মূল অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু সে সময় যারা রাজনীতির কারবারী তারা পরাধীন দেশকে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে উদ্ধার করার মহান ব্রত নিয়েছেন সুতরাং তাদের এই হত দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের কথা ভাববার সময় নেই। দেশ বিদেশীদের হস্তগত এই নিয়ে আক্ষেপ, উত্তেজনা, কবিতা লেখা খবরের কাগজ চালাতে গিয়ে তারা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন যে দেশের মেরুদণ্ড যারা সেই কৃষকদের আপনার জন হিসেবে ভাবা চাই নইলে আখেরে কোন লাভ নেই, কেন না, এ দেশের স্বায়ত্বশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে। কবি নিজস্ব উদ্যোগে পল্লীর উন্নতির নানা চেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু 'আমার সাধ্য কি! এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব। সে শিক্ষা সে শক্তি আমার নেই।'

কৃষি-শিল্প-সংস্কৃতিতে রাশিয়ায় অগ্রগতি তাকে বিস্মিত করেছে আবার ভারতবর্ষের চাষী-মজুরদের দুর্দশা তাকে ব্যথা দিয়েছে। দু'দেশের তুলনা বারংবার টেনেছেন 'রাশিয়ার চিঠি'তে। চাষীকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে যেটা প্রয়োজন তা খুব পরিষ্কার করে তিনি জানাচ্ছেন (ক) জমির স্বত্ব জমিদারের নয় সে চাষীর। (খ) সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্রে একত্রে করে নিয়ে চাষ করতে না পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি জানেন যে এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ। জমির স্বত্ত্ব চাষীকে দেবার বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে সঠিক জেনেও বাস্তব অবস্থার কথা ভেবে তিনি বোঝেন যে এটা সম্ভব নয় — এ কারণেই যে এদেশের দরিদ্র চাষী দরিদ্রের চাপে জমি তুলে দেবে লোভী মহাজনের হাতে। জমি অধিকার টুকু দিয়ে দেওয়া হয়ত যায় কিন্তু তা টিকিয়ে রাখবার মতো শক্তিও তো থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথ একথা যখন বলেছেন তার বহুবছর পরে পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জমি পাট্টা হিসেবে দরিদ্র প্রান্তিক চাষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে জমির একটা বড় অংশ অল্পদিনেই এরা হারিয়েছে।

চাষের জমি একত্র করে চাষ না করলে যে কৃষির উন্নতি নেই একথা তিনি জানেন তবে এ চাষ হবে সমবায়

নীতি অনুসারে। রাষ্ট্রের হাতে জমির মালিকানা চলে যাক এ তার অভিপ্রায় নয় কেননা তিনি ব্যক্তিগত মালিকানাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে চান না। সাধারণ মানুষের কিছুটা পরিমাণে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রয়োজন নিজেকে প্রকাশ করবার জন্যে। মস্কোতে একটি কৃষি ভবন, যেখানে কৃষকদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টা চলেছে, প্রদর্শনকালে কবির সঙ্গে কৃষকদের মত বিনিময় হয়। চাষীদের সংকোচহীন ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে। এখানে কবি লক্ষ্য করেন কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের বিষয়ে চাষীদের মধ্যে অনেকেই উচ্ছসিত হলেও এরকমও অনেকে আছেন যারা এ প্রক্রিয়ায় অসম্মত। রবীন্দ্রনাথের অভিমত এই অসম্মতির কারণ লুকিয়ে মানবচরিত্রের মধ্যে, 'নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই। সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়।'

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে সমাজে নিশ্চয়ই উচ্চমানের কিছু মানুষ আছেন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অস্বীকর করার মতো মনের উদারতা যাদের আছে। কিন্তু এরা কতিপয়। সবাই নয়। বেশিরভাগ সাধারণ সংসারী মানুষের কাছে সম্পত্তি 'তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা — সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়।' সম্পত্তি তাঁর মতে, তা অবশ্যই সাধারণ মানুষের কাছে, শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র নয়। সম্পত্তির যদি শুধুমাত্র ভালভাবে জীবিকার ব্যবস্থা হবে এই জেনে সম্পত্তি ত্যাগ করা কঠিন হত না। কিন্তু সম্পত্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আত্মপ্রকাশের প্রশ্ন। আত্মপ্রকাশের অন্যান্য আরো অন্য মাধ্যম রয়েছে। যেমন 'বুদ্ধি' কিংবা 'গুণপনা'। কিন্তু বুদ্ধি বা গুণপনা কেড়ে নেবার বিষয় নয়। কিন্তু সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে তাকে ফাঁকি দেওয়া যায়। এ কারণেই সম্পত্তি নিয়ে সমাজে এতো হানাহানি এবং দ্বন্দ্ব। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতির ফলে সম্পত্তি যদি পুঞ্জীভূত হয় কতিপয় মানুষের হাতে সমাধানের উপায় হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমা তার বাইরেকার উদ্‌বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্য ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তি মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না।' কবি বলতে চান মানুষের নিজের জন্য নিজস্ব কিছু চাই। সমস্তই পরের জন্য মানব চরিত্রে এ যেমন অসম্ভব তেমনি আবার স্বার্থপরতাও বর্জনীয়। কেননা আত্মা এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেই মানুষের মঙ্গলের সূত্র লুকিয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কবি উল্লেখ করেন। সেটা হল মানব প্রকৃতির উপর রাষ্ট্রের জোর খাটানো চলে কিনা। রবীন্দ্রনাথ বলেন স্বাতন্ত্র্য মানবচরিত্রের একটি অনস্বীকার্য সত্য তার উপর জোর খাটাতে গেলে লড়াই বাধবেই। কবি খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন সোভিয়েটরা এ সত্য বোঝেনি এবং সে কারণে সেখানে জবরদস্তির সীমা নেই। তার ভাষায় 'সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।' জমিকে কেন্দ্র করে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর তীব্র টান যা কবি উপলব্ধি করেছিলেন তার সত্যতা কি আমরাও আজ উপলব্ধি করছি না। বিশেষত জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারত জুড়ে?

ধনতন্ত্র-সমাজতন্ত্র-সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

বলশেভিকদের দেশের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ আকরে লেখেননি 'রাশিয়ার চিঠি' নাম থেকেই তা বোধগম্য। রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, সুরেন্দ্রনাথ কর, নন্দলাল বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তাঁর স্নেহধন্য মানুষকে যে চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে ১৩৩৬-৩৭ বঙ্গাব্দে। পরে ১৯৩৮ সালের ২৫ বৈশাখ 'রাশিয়ায় চিঠি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রাশিয়ার চিঠি পাঠ করলে দেখা যাবে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনার ফাঁকে তিনি রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন ভারতবর্ষে তার নিজ অভিজ্ঞতার কথা। এই দেখবার ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন সামাজিক - অর্থনৈতিক - রাষ্ট্রিক বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ করেছেন নিজস্ব বক্তব্য। সেই বক্তব্যগুলি অনুসন্ধান করেই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

ধনতন্ত্রের সাধনা ব্যক্তির লোভকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির লোভ ও ভোগকে ঘিরে এই যে ব্যবস্থা তাকে সমস্ত অসুখ - অশান্তির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি জানেন যে ইয়োরোপে সমস্ত দেশেরই সাধনা ব্যক্তির এই লোভকে ঘিরে এবং এই দেশগুলিই রুশদেশের শোষিত মানুষের এই জাগরণকে ভাল চোখে দেখছে না। তার অগ্রগতিকে বাধা দিতে চাইছে। কিন্তু তবু ধনতন্ত্রের চলনে যে 'মন্থন - আলোড়ন', 'পৌরাণিক সমুদ্র মন্থনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই উঠেছে'। কিন্তু তারপর সেই 'সুধা'র পরিণতি কি? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সুধার ভাগ কেবল একদলই পাচ্ছে, অধিকাংশই পাচ্ছে না।' তাহলে কি মানব প্রকৃতির মধ্যেই লোভ আছে? আর লোভ থেকে যে ভোগের উৎপত্তি তা অসাম্য আনবেই সমাজে? এর থেকে কোনো পরিত্রাণের উপায় কি নেই? কবি লিখেছেন সবাই যখন এই অসাম্যকেই অনিবার্য ভাবছে, ভাবছে প্রতিযোগিতা থেকে বুঝি মানুষের পরিত্রাণ নেই তখন সোভিয়েটদের এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এই অনিবার্যতাকে উপেক্ষা করবার সাহস যোগাচ্ছে মানুষের মনে। এবং তা পৃথিবী জুড়ে।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলো কবি ইতিমধ্যেই দেখেছেন। কিন্তু সামগ্রিকতার পরিচয় বা পরীক্ষা সেখানে অবান্তর। তাদের মধ্যে যে উদ্যম তা যেন আপন আপন ক্ষেত্রে— 'কোথাও আছে পলিটিক্স, কোথাও আছে হাসপাতাল, কোথাও আছে বিশ্ববিদ্যালয়, কোথাও আছে মিউজিয়াম—বিশেষদজ্ঞরা তাই নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।' কিন্তু সমাজতান্ত্রিক

দেশটিতে এসে কবি দেখলেন— 'এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে। সবকিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।' এই অখণ্ডতার সাধনা কবির মনকে টেনেছে যার অভাব তিনি ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনুভব করেছেন। ধনতান্ত্রিক দেশে চিত্তের নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব কেননা সেখানে অর্থ এবং শক্তিকে নিয়ে যে সাধনা চলেছে তা ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় যে পরীক্ষা শুরু হয়েছে তাতে 'সাধারণের কাজ, সাধারণের চিত্তে, সাধারণের স্বত্তা বলে একটা অসাধারণ স্বত্তা এরা সৃষ্টি করতে লেগে গেছে। সমাজতান্ত্রিক এই সাধনার সঙ্গে তিনি উপনিষদের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। উপনিষদে বলে এ বিশ্বের সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিগত লোভ এই একের উপলব্ধির প্রধান অন্তরায়। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই সবাই মিলে ভোগ কর ('তেন তক্তেন ভুঞ্জীথাঃ')। উপনিষদের এই আদর্শকেই অর্থনৈতিক প্রযোগের মধ্যে এনে মিলিয়েছে সমাজতান্ত্রিক জীবনযাপন। তারা আর সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে সম্পদের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলে ধনের লোভ অনিবার্য এবং তা থেকেই অসাম্য।

অসাম্য যেখানে প্রকট হয় বিদ্রোহ সেখানে অনিবার্য। অসাম্য পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। তাহলে রাশিয়াতেই বিপ্লব ঘটল কেন? ঘটল এ জন্যেই যে অসাম্য এদেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল — 'সমস্ত শরীরের রক্ত দুষিত হয়ে উঠলেও এক একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে।' রাশিয়ার মত ফ্রান্সেও একদা বিপ্লব ঘটেছিল। ফ্রান্সের বিপ্লবীরা বুঝেছিলেন অসাম্য শুধু ফ্রান্সে নেই তা ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বব্যাপী। সে দেশের বিপ্লবের বাণী — সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। রুশ দেশও ডাক দিয়েছে বিশ্ব বিপ্লবের। কবি সন্দিগ্ধ যদিও যে ফ্রান্সের মতো এ দেশের বিপ্লবও টিকবে কিনা - বিশ্বের অন্যত্র গ্রহণীয় হবে কিনা কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও স্বজাতির সমস্যা যে সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত রুশ বিপ্লবের এই বাণীকে তিনি নির্দ্বিধায় সমর্থন করেছেন।

ধর্মতন্ত্র

রবীন্দ্রনাথকে বুঝেছি এ কথা বলবার অধিকার রাখি না আগেই বলেছি। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' পড়ে মনে হয়েছে বস্তুবাদ বা কোন অর্থনৈতিক নির্দ্দিষ্টবাদ তার পথ নয়; রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি 'গোলমেলে' সমস্যাগুলির উপরে তিনি স্থান দিতেন আত্মার সাধনাকে। পৃথিবীর তীর্থে তিনি এসে পড়েছেন। এই তীর্থে এসে 'মানুষের দেবতাকে স্বীকার করে এবং প্রণাম করে যাব আমার জীবনদেবতা আমাকে সেই মন্ত্র দিয়েছেন।' ভাববাদের এই সুউচ্চ শিখর স্পর্শ করবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু বোঝা যায়, নাস্তিকতা তার পথ নয়। কিন্তু তবু তিনি যখন লেখেন 'ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভাল।' তখন রবীন্দ্রনাথ বলেই বিস্মিত হই না। সোভিয়েট - বিপ্লবীরা ধর্মতন্ত্রকে যে নির্মূল করে দিয়েছে কবি তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যে ধর্ম বিষকন্যার মতো সে অত্যাচারী রাজার মতো শারীরিক অত্যাচারে প্রজাকে মারে না সে মুগ্ধ করে মারে। 'শক্তিশেল' -এর চেয়ে 'ভক্তিশেল' যে আরো ভয়ংকর কবি তা সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ

রাশিয়ায় এসে কবির মনে হয়েছিল এ দেশে না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন তাঁর অসমাপ্ত থেকে যেত। যদিও কবি মূলত রুশ দেশে শিক্ষার বিস্তারের অগ্রগতি দেখবার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন কিন্তু এখানে পৌঁছে শিক্ষার সর্বব্যাপী বিস্তার তো তাঁকে মুগ্ধ করেই ছিল কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিকৃষকদের মধ্যে আর্টের প্রতি আগ্রহ, তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ, ঘরে-বাইরের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করবার সাহসও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। সমগ্র 'রাশিয়ার চিঠি' জুড়ে সেই কথা বারবার তিনি উল্লেখ করেছেন। আবার এই প্রশংসার ফাঁকে বলশেভিকদের পরীক্ষা-নীরিক্ষায় এবং তাদের মতাদর্শ সম্পর্কেও স্বল্প পরিসরে হলেও, নিজস্ব মতামত রেখেছেন —যা আজকের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রাশিয়ার চিঠির উপসংহারে এসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সোভিয়েট রাশিয়ার মার্ক্সীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার বুদ্ধিকে 'এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ।' কবি উল্লেখ করেছেন যে এক ধরণের জেদের মুখে এই বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদটি সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার তৎকালীন সমাজ - শাসন দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে আশুফল লাভের আশায় রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যকে মানতে চাইছে না। কিন্তু কবি এর মধ্যেই বিপদের কারণ প্রত্যক্ষ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় তখন সে দেশের অন্দরে বাহিরে শত্রু। শত্রুপক্ষ বলশেভিকদের কাজ পণ্ড করে দিতে চাইছে। তাই 'নির্মাণ কার্যের ভিতটা পাকা' করবার স্বার্থে বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি খাটাতে পিছপা হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই বল প্রয়োগকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন, 'গরজ যত জবুরিই হোক, বল জিনিসটা একতরফা জিনিস। ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টিকার্যে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধোর করে নয়। তার নিয়মকে স্বীকার করে।'

রুশ দেশে মার্ক্সবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ রাশিয়ার চিঠি পাঠ করবার কালে আমাদের গভীরভাবে নাড়া দেয়। মার্ক্সবাদে এক ছাঁচে ঢালবার যে প্রয়াস তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার যে

বিপদের দিকটি তিনি অনুমান করেছিলেন তা মিথ্যে প্রমাণিত হয়নি।

মার্ক্সীয় ইতিহাস পাঠ করতে গিয়েও আমরা দেখেছি যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পূর্বে মার্ক্সবাদকে একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হত। মার্ক্সবাদ সে সময় পর্যন্ত কঠোরভাবে সংহিতায় পরিণত হয়নি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পরই তাত্ত্বিক এবং পন্থা উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্নধর্মী চিন্তা ভাবনার সমন্বয়ে মার্ক্সবাদকে সমৃদ্ধ করবার প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সময়েও কতিপয় মার্ক্সবাদী মার্ক্সবাদকে অন্যান্য দার্শনিক চিন্তার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করবার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন (উদাহরণস্বরূপ কান্টীয় এথিক্সের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সংযুক্ত করে এথিক্যাল স্যোসালিজম)। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাশিয়ায় মার্ক্সবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবার পর এবং কমিন্টার্ণের প্রতিষ্ঠার পর মার্ক্সবাদের ভিন্নতর ব্যাখ্যার প্রতিও নির্মম সমালোচনা শুরু হয়েছিল। লুকাচের 'হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লাস কনসাসনেস' বইটির বিরুদ্ধে কমিন্টার্ণে জিনোভিয়েভ বিষোদগার করেছিলেন। উষ্মার কারণ এ ধরণের প্রচেষ্টায় ভাববাদী দর্শনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ভিন্নধর্মী যে সমস্ত মার্ক্সীয় চর্চায় সরকারি সিলমোহর নেই সেগুলিকে ব্রাত্য করে রাখা হল। মার্কসের বিচ্ছিন্নতাবোধের তত্ত্ব কিংবা স্বাধীনতার তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে মার্ক্সবাদের নতুনতর যে ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা শুরু হল, কিংবা আরো পরে গ্রামশির 'প্রিজন নোটবুক' প্রকাশিত হবার পর ইয়োরোপের মার্ক্সীয় চিন্তার জগতে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল, মার্ক্সবাদের অভিভাবকেরা তাকে গুরুত্বই দেয়নি। এর ফলে মার্ক্সবাদ সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং পুঁজিবাদ নিজ পথেই এগিয়েছে। I see yuo betrayed by your disciples/only your enemies frmained what they were.'

রাশিয়ার বিপ্লবীদের সাহসে তিনি মুগ্ধ ঠিকই। কিন্তু অত্যুৎসাহে সেখানে যে মাতামাতির ঔদ্ধত্য চলছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন, 'মানব প্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে, একথা ভুলে যায়; মনে করে তাকে আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপর লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার তর সয় না।' মানুষকে শাসন করতে হবে 'তার স্বভাবের সঙ্গে রফা করে' লাঠির ডগায় নয় এই ছিল কবির বক্তব্য। এই বক্তব্যের সঙ্গে গ্রামসির হেজিমনি ও ডমিনেসের তত্ত্বের মিল কেউ খোঁজবার চেষ্টা করতে পারেন। পরে রবীন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন, 'যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করিনে। প্রথম কারণ নিজের মত সম্বন্ধে আগেভাগে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সুবুদ্ধি নয়, সেটাকে কাজে খাটাতে খাটাতে তবে তার পরিচয় হয়। ওদিকে ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে।'

রাশিয়ার চিঠির ১৩নং পরিচ্ছেদে কবি খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিক মতো ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো।' তিনি এ কথাও পরিষ্কার করে লিখেছেন, 'এখানে জবরদস্ত লোকের এক নায়কত্ব চলছে। এই রকম একের হাতে দশের চালনা দৈবাৎ কিছুদিনের মতো ভাল ফল দিতেও পারে, কিন্তু কখনোই চিরদিন পারে না। উপযুক্ত মতো নায়ক পরম্পরাক্রমে পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়।'

রবীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেন তা কখনই ঊনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ভাবধারার সঙ্গে মিলে একাকার নয়। তিনি ব্যক্তির বিকাশ সমাজের আর সকলকে উপেক্ষা করে প্রকাশিত হবার পক্ষপাতি নন। আবার সমষ্টির বাইরেও যে ব্যষ্টির এক নিজস্ব পরিচয় আছে সে কথাও জোর দিয়ে বলেছেন। রুশ দেশে মার্ক্সবাদের চলন যেভাবে শুরু হল তাতে ব্যষ্টির যুপকাষ্ঠে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বলিপ্রদত্ত হয়ে গেল। অথচ এরকমটি না হতেও পারত, বিষয়টি অনুধাবণ করা যাবে যদি মার্ক্সবাদের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসটি পর্যালোচনা করা যায়। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মার্ক্সবাদের মধ্যে প্রায় বিপরীত ধর্মী দুটি ধারার প্রবর্তন হয়েছিল। 'মানবতাবাদী' ও 'বৈজ্ঞানিক'। রুশ দেশে যা সরকারি মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল তা এই তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' মার্ক্সবাদ। এই ধঁচের ধনতন্ত্রের অঙ্গব্যবচ্ছেদ করে বারংবার ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পতন এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করেছেন। মার্ক্সের ইতিহাস এবং দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা, তাঁর উদ্ধৃত্ব মূল্যের রহস্য উদ্ঘাটন, শ্রম ও শ্রমশক্তির ধারণা এবং ধনতন্ত্রের বাহ্যিক রূপ (appearence) ও প্রকৃত সত্তা (essence)-র মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় ইত্যাদি উপাদানগুলি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্ক্সবাদ পরিবর্তনশীলতার গুণটি বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক নির্দ্দিষ্টবাদে পর্যবসিত হল। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যাবে মার্ক্সবাদকে কতগুলি অপরিবর্তনীয় ও নির্ভুল নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস নেওয়া হল যেন মার্ক্সবাদ প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতোই নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট।

মার্ক্সবাদের অন্য একটি ধারা কিন্তু উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার বিকল্প এক মৌলিক স্বাধীনতার ধারণার প্রবর্তনে প্রয়াসী হয়েছিল। এ ধারকটিকে মার্ক্সবাদের মানবতাবাদী ধারা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। মানবতাবাদী ধারাটির উদ্ভব মার্ক্সের প্রথম দিকের লেখাগুলি থেকে উঠে এসেছিল। এই লেখাগুলিতে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদের (alienation) এবং মৌলিক স্বাধীনতার ধারণার উপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার এই ঝোঁকের

উপর নির্ভর করেই রোজ লুক্সেমবার্গ, লুকাচ, গ্রামশি ক্রোশে তাঁদের মার্ক্সবাদের মতাদর্শ প্রস্তুত করেছিলেন। এদের সম্মিলিত চিন্তাধারা এসই সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের অবদানকে জুড়ে দেখলে যে পশ্চিমী মার্ক্সবাদের সন্ধান পাওয়া যাবে সে ধারাটির চর্চা রুশদের প্রবর্তিত মার্ক্সবাদ শুধু উপেক্ষাই করেনি এই ধারাটিকে অপছন্দ করে অচ্ছুৎ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। কেননা এই ধারাটি উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকল্প সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিদের প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রেরও সমালোচনা করেছিলেন। 'বৈজ্ঞানিক' মার্ক্সবাদের জবরদস্তি যে শুভ হয়নি এ কথা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে স্বীকার করলে অত্যুক্তি হয় না। এবং সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচনার যথার্থতাও বেশ প্রতিষ্ঠা পায়।

১. মস্কো শহরের উপনগরীতে একটি প্রাসাদ ভবনে বসে রবীন্দ্রনাথ এ শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে প্রবল মিল খুঁজে পাওয়া যায় 'মেমোয়ার্স'-এ আর একজন প্রখ্যাত বাঙালি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বর্ণনার। দু-জনেই লক্ষ্য করেছিলেন শহরের অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও জারের আমলের চেহারা দেখা দিচ্ছে—কবির ভাষায় 'যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো, যেন ঢাকাই ধুতি রিফু করা।' মানবেন্দ্রনাথও মস্কো শহরের অপরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতাহীন ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ির চলা প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা দুজনেই আবার বাতায়ন খুলে সবুজ প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যে মুগ্ধ হয়েছেন। কবি লিখেছেন, ''জানালার ভিতর দিয়ে দেখি দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে।'' মানবেন্দ্রনাথও এই সবুজ সৌন্দর্যের ওপারে ক্রেমলিন দেখে শিউরে উঠেছিলেন। দুজনেরই রুশ দেশে এসে মনে হল বিপ্লবের তীর্থভূমিতে পৌঁছানো গেল।

২. ১৯৩০ সালের পূর্বে ও ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৬০ -এর ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি রাশিয়ায় ছিলেন। রাশিয়ায় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান V.O.K.S.-এর নিমন্ত্রণে তিনি ওদেশে যান। তাঁর যাত্রাসঙ্গী ছিলেন হ্যারি টিম্বারস্ কুমারী মার্গট আইনস্টাইন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরিয়ান উইলিয়মস্ ও অমিয় চক্রবর্তী।

৩. রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা অনুভব করা যায় কবির রাশিয়া দর্শনের অব্যবহিত পরে আমেরিকায় এসে লেখা তাঁর চিঠি-পত্র থেকে। ৩১ অক্টোবর ১৯৩০ সালে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ''এবারের রাশিয়ার অভিজ্ঞতা আমাকে গভীরভাবে অনেক কথা ভাবিয়েছে। প্রচুর উপকরণের মধ্যে আত্মসম্মানের যে বিঘ্ন আছে সেটা বেশ স্পষ্ট চোখে দেখতে পেয়েছি। সেখান থেকে ফিরে এসে মেঙেলদের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগলো না — ব্রেমেন জাহাজের আড়ম্বর এবং অপব্যয় প্রতিদিন আমাকে বিমুখ করেছে। ধনের বোঝা কী প্রকাণ্ড এবং কী অনর্থক। জীবনযাত্রার কত জটিলতা সহজেই এড়ানো যেতে পারে।''

৪. পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ২১ নভেম্বর ১৯৩০ সালে লিখছেন, ''জমিদারির অবস্থা লিখেছিস। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল। এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারির ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।''

৫. V.O.K.S.-এর তরফে অধ্যাপক পেট্রভ রবীন্দ্রনাথকে একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করে জানতে চান যে রাশিয়ার কৃষি - শিল্প শিক্ষা সংস্কৃতি উন্নতি দেখে তাঁর অভিমত কি? ভারতবর্ষে তার নিজের কর্মক্ষেত্রে তিনি কি ধরণের বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই টেলিগ্রামের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন ''Your success is due to turning the tide of wealth from the individual to collective humanity. Our obstacles are social and political inanity, bigotry and illiteracy.''

৬. নায়কতন্ত্র যে তার অপছন্দ একথাও স্পষ্ট ভাষায় রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছেন তিনি, ''কোন বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি পছন্দ করিনে। ...জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃষ্ট ও পালিত না হয় তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে পাখা যায় আড়ষ্ঠ হয়ে যায়। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।''

৭. রুশ দেশেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতটা তার প্রমাণ পাওয়া যায় কবির প্রয়াণের পর লণ্ডন - স্থিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মেইস্কির শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে। তিনি লিখেছেন, ''may i express my profound grief at the passing of a great Indian writer and poet whose name was so familior in my conutry and whose works are so popular with the masses of the Soviet people.'' (ভূমিবার্তা থেকে)